চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অহংকারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- অহংকার আছে বলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ির দরজার সামনে এই অহংকাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না করলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধ হয়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটি এসেছে। এসে বললে, 'কি কাজ করতে হবে বল। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙব।' সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতটি বললে, 'এইবার তোমার ঘাড় ভাঙি?' সে বললে, 'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি'। এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললে, 'মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি?' গুরু তখন বললেন, তুই এক কর্ম কর, তাকে এই চুলগাছটি সোজা করতে বল। ভূতটি দিনরাত ওই করতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল! অহংকারও এই যায়, আবার আসে।

"অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

"কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

"নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার লন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম'। লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য) তাই আর আমি গেলাম না'।"

[*পূর্বকথা -- কেশব ও গৌরী -- সোঽহম্‌ অবস্থার পর দাসভাব*]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, 'অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব বললে, -- তাহলে মহাশয় দল কেমন করে থাকে?

"আমি বললাম, 'তোমার এ কি বুদ্ধি! -- তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ কর, -- যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি, -- ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান, -- এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই'।"

ত্রৈলোক্য -- অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- পাছে অহংকার হয় বলে গৌরী 'আমি' বলত না -- বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম 'ইনি'; 'আমি খেয়েছি,' না বলে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজোবাবু তাই দেখে একদিন বললে, 'সে কি বাবা, তুমি ও-সব কেন বলবে? ও-সব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার তো আর অহংকার নাই। তোমার ও-সব বলার কিছু দরকার নাই।'

"কেশবকে বললাম, 'আমি'টা তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক; -- যেমন দাস। প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন 'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি' -- সোঽহম্। আবার যখন অহং বুদ্ধি আসত, তখন দেখতেন, আমি দাস তুমি প্রভু! একবার পাকা 'সোঽহম্' হলে পরে, তারপর দাসভাবে থাকা। যেমন আমি দাস।"

[*ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ -- ভক্তের আমি -- কর্মত্যাগ*]

(কাপ্তেনের প্রতি) -- "ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে -- (১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

"কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ হয়। তবে যদি বল জনকাদি কর্ম করেছিলেন; তা কি জানো, তখনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিত হত। আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আবার যাহাদের কর্মে আসক্তি আছে, তাহাদের অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- জ্ঞান হলে বেশি কর্ম করতে পারে না।

ত্রৈলোক্য -- কেন? পওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন, -- এমন কি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- হাঁ, হাঁ, -- তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক, -- চিকিৎসা করবার সময় কোনরূপ ভুল হবে না। ভক্তিলাভ করে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই!

"ঈশ্বরই সব করছেন, আমরা যন্ত্রস্বরূপ। কালীঘরের সামনে শিখরা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বললাম, দয়া কাদের উপর? শিখরা বললে, 'কেন মহারাজ? আমাদের উপর।' আমি বললাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখছেন; তা তিনি দেখবেন না তো বামুনপাড়ার লোকে এসে

দেখবে? আচ্ছা, যারা 'দয়াময়' বলে, তারা এটি ভাবে না যে, আমরা কি পরের ছেলে?"

কাপ্তেন -- আজ্ঞা হাঁ, আপনার বলে বোধ থাকে না।

[*ভক্ত ও পূজাদি -- ঈশ্বর ভক্তবৎসল -- পূর্ণজ্ঞানী*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তবে কি দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবে। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয় -- আমরা সব দূরের লোক, পরের ছেলে।

"সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলেছিল, 'ঈশ্বর অনন্ত তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন? না গান শুনবেন? ও-সব মনের ভুল।'

"নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর আনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়া আছে। হাতে কি একটি জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা! অতি সঙ্কোচভাব! বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দ্বারবান, হাতে কি আছে? দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সম্মুখে রাখলে -- ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আনলে?

"তিনি ভক্তাধীন! দুর্যোধন অত যত্ন দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বিদুরের শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন!

"পূর্ণজ্ঞানীর আর-একটি লক্ষণ -- 'পিশাচবৎ'! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই -- শুচি-অশুচির বিচার নাই! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ, দুইজনেরই বাহিরের লক্ষণ একরকম। পূর্ণজ্ঞানী হয়তো গঙ্গাস্নানে মন্ত্রপাঠ করলে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয়তো একসঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই!"

[*কর্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- কর্ম কতক্ষণ?*]

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম।

"একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখির চটকা ভাঙলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তরদিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে মাস্তুলে আবার বসল।

"অনেকক্ষণ পরে পাখিটা আবার উড়ে গেল -- এবার পূর্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে আর

কোনোও চেষ্টাও নাই।”

কাপ্তেন -- আহা কেয়া দৃষ্টান্ত!

[*ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে ত্যাগ অনেকের হয় না। কুটিচক আর বহুদক। সাধকের ভিতরও কেয় কেয় অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক -- কিনা জল খায়! যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে জায়, তখন এক জায়গায় কুটির বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

“কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ এই আছে, এই নাই!

“প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না! দুঃখের ভাগই বেশি! আর কামিনী-কাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।

“কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘মহাশয়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই’?”

[*উপায় -- ব্যাকুলতা -- ত্যাগ*]

“আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, -- যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

“একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তো ভাল হয়, -- স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামরাতে গিয়ে সাপের বিষ ওই মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

“লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল! এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মরার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটি মরার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা করে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়া দাও -- ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া করে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, ওই খুলির ভিতর পড়ে গেল।

“ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন -- সব সুযোগ করে দেবেন।”

কাপ্তেন -- কেয়া দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- হাঁ, তিনি সুযোগ করে দেন। হয়তো, -- বিয়ে হল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে, হয়তো ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হয়ে গেল, তাহলে তোমায় আর সংসার দেখতে হল না। তখন তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্যের কিরণ পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

[*ঈশ্বরলাভের পর সংসার -- জনকাদির*]

"তবে জ্ঞানলাভের পর কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য, -- এ-সব সে আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞানলাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সার্সীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়, -- কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

"ঈশ্বরই কর্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

"তাই জ্ঞানীরও অহংকার করবার জো নাই। মহিম্নস্তব যে লিখেছিল, তার অহংকার হয়েছিল। শিবের ষাড় যখন দাঁত বার করে দেখালে, তখন তার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। দেখলে, এক-একটি দাঁত এক-এক মন্ত্র। তার মানে কি জানো? এ-সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার করলে।

"গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হালকা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু হতে যায়! -- শিষ্য পাওয়া যায় না!"

ত্রৈলোক্য ছোট খাটটির উত্তরে ধারে মেঝেতে বসিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আহা! তোমার কি গান!" ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন --

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়।।

গান - তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ॥

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, "আহা! তুমিই সব! আহা! আহা!"

গান সমাপ্ত হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউতালর দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাস্টারকে হঠাৎ বলিলেন, "কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?"

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

[*নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ*]

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাস্টারকে বলিতেছেন, -- "তাই তো কার গাড়িতে যাই?"

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুরবাড়িতে সব স্থানে ফরাশ আলো জ্বালিয়া দিল! রোশনচৌকি বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব মন্দিরে, বিষ্ণুঘরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্তনান্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মার ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই-একটি ছোকরা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উথলিয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি এসেছ!"

ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টি ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, "নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়? কি বল?"

মাস্টার -- যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়িতে। (অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আজ, রাত হল।

ভক্তেরা সকলে একে এক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।